বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয় - মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে
(জন্মশতবর্ষে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মরণে)

শঙ্কর রায়

কার্ল মার্কসের মৃত্যুশতবর্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি গবেষণা-সন্দর্ভ 'সাম থটস ওন মার্কস অ্যান্ড রিলিজ্যন' (নয়া দিললীতে 'মার্কস, মার্কসিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়া' সেমিনারে, ২২-২৪ এপ্রিল, ১৯৮৩-এ পঠিত) বিজ্ঞান ও ধর্মকে মার্কসবাদের দৃষ্টিকোন থেকে বিচারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। পঁচিশ বছর পরে তার পুর্নপাঠ বর্তমান দুনিয়ার দার্শনিক সংকটে এই প্রতিবেদকের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি হীরেন্দ্রনাথকে নিবেদিত করছি।

মার্কস ধর্ম সম্পর্কে বিশদভাবে লেখেন নি, যদিও অল্প পরিসরে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এই স্বল্পতার জন্যে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করা হয়। তিনি আস্তিকদের কখনো সেই অর্থে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করেন নি। তাঁর কন্ট্রিব্যুশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ হেগেল'স ফিলজফি অফ রাইট- প্রবন্ধে লিখেছিলেন- 'ধর্ম-নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, আত্মাহীন আত্মার মত হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়। জনগণের আফিম'[১]। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, ধর্ম মানুষের সৃষ্টি, ধর্ম মানুষ গড়ে নি। ধর্ম মানুষের সচেতনা, আত্ন-উপলব্ধি, কিন্তু এ উপলব্ধি বিশ্বচেতনাকে উল্টো করে দ্যাখে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই উল্টো বা ভ্রান্ত উপলব্ধি নিরসনের জন্যে। তিনি ধর্মের তথা ধর্মগুরুদের আধিপত্যের (কখনো সখনো প্রাক-সামন্তবাদী নিপীড়ন) সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব বা দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। জনগণের প্রকৃত সুখীজীবন কায়েম না হলে ধর্মভীরু মানুষের কুসংস্কার বা মায়া (অর্থাৎ ধর্মেই সুখ) থেকে মুক্ত হবেনা[২] ।

প্রচ্ছন্ন পরিহাস তাঁর ঐ প্রবন্ধে ছিলনা, তা মোটেই নয়। 'স্বর্গের সমালোচনা পরিণত হয় পাথিব সমালোচনায়, ধমতত্বের সমালোচনা রাজনীতির সমালোচনায়'। হীরেন্দ্রনাথের মতে মার্কস এ নিয়ে সময় নষ্ট করেন নি, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। ডি বি ম্যাক্কাওনের (দি ক্লাসিক্যাল মাকসিস্ট ক্রিটিকস অফ রিলিজ্যন-মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, কাউটসকি- গ্রন্থের রচয়িতা) একই মত। অর্থাৎ মার্কস ধর্ম সম্পর্কে কোনো বিশদ তত্বায়ন করে যাননি। কিন্তু মার্কসবাদ তো কোনো আপ্ত বাক্য নয়। মার্কস রেখে গেছেন মার্কসীয় তথা হেগেলীয় বিচার পদ্ধতি (হেগেলের সমালোচনা করলেও আজীবন তিনি নিজেকে হেগেলের শিষ্য মনে করতেন), যা আমাদের মার্কসীয় দৃষ্টিতে ধর্ম-বিচারের প্রধান আয়ুধ। সে কারণেই প্রয়োজন হলে 'ক্রিটিক্যাল মার্কসিজম'-এর আশ্রয়ও নিতে কুণ্ঠিত হওয়া যাবেনা[৩]। ডেভিড ক্যট-এর মতে মার্কস ধর্মকে গীর্জার বা ধর্মযাজকদের চোখ দিয়ে দেখার

---

[1] কার্ল মার্ক্সের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি ছিলো –'Religious distress is at the same time the expression of real distress and the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people'.

[2] The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up the conditions which needs illusions" (Karl Marx: Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right).

[3] লেলিন গোর্কিকে লিখেছেন, "On the question of God, the Godlike and everything connected with it, there is a contradiction in your position…it is clearly reactionary and reactionary. Like the Christian socialists (the worst variety of 'socialism', and its worst distortion, you make use of a method which despite your best

বিরোধিতা করেছিলেন। সেজন্যে তিনি ক্রিশ্চিয়ান মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যেমন ভেনেজুয়েলার বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট উগো শ্যাভেজ যিশু খৃষ্টের মানবধর্মের কথা প্রায়শ উল্লেখ করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মকে জর্মন দর্শনের সমালোচনার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন, অনুসরণ করেছেন তাঁদের পূর্বসূরীদের (যথা ডেভিড ফ্রেডরিক স্ট্রস ও ব্রুণো বয়ার)। 'মানুষকে জন্তুদের থেকে পৃথক করা যায় চেতনাবোধ ও ধর্ম দিয়ে, এ কথা মেনে নিয়েও বলেছেন যে তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে আধিভৌতিক, রাজনৈতিক, বিচারব্যবস্থাগত ও নৈতিক চেতনা - আর এর সবটাই পরিচালনা করে ধর্মগত ও ধর্মতত্বগত ব্যবস্থাপনা (মার্কস -এঙ্গেলস : ফয়েরবাখ: অপজিস্যন অফ দি মেটেরিয়ালিস্ট অ্যান্ড আইডিয়ালিস্ট আউটলুকস , প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৬, পৃ ২৩-২৫)। এঙ্গেলস নিজে অন্যভাবে ধর্মের বিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন, কেন ধর্মকে মার্কস আফিম বলেছিলেন তার পরোক্ষ ব্যাখ্যা মেলে[৪]।

লেনিনও ধর্ম সম্পর্কে রচনায় কখনো যান্ত্রিকতা বা গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু তিনি ধর্ম ও ধর্মযাজকদের প্রতিক্রিয়ার বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রমজীবিদের সচেতন থাকতে বলতেন।রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র খসড়া কর্মসূচির ধর্ম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন - 'পার্টির উদ্দেশ্য নিপীড়নকারী শ্রেণীর সঙ্গে সংগঠিত ধর্ম-প্রচারের সংযোগ ছিন্ন করা এবং শ্রমজীবি জনগনকে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে প্রকৃত মুক্ত করা। তার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও ধর্ম-বিরোধী প্রচার করা। তবু দেখতে হবে যাতে আস্তিকদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না লাগে, নচেৎ ধর্মান্ধতা বেড়ে যাবে।' (লেনিন-সংগৃহীত রচনাবলী, খন্ড ২৯,পৃ ১৩৪)।

লেনিন ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তখন চার্চ ও জারের যুগলবন্দী এবং ধর্মের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে অনড় অবস্থান অনিবার্য ছিল, তবু তিনি বুঝতে ভুল করেননি যে সাধারণ ধর্মভীরু মানুষরা নিপীড়িত শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য তিনি আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে সংগ্রামের কতর্ব্য থেকে কখনো সরে যাননি। গোর্কিকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে তা পরিষফূট । গোর্কি প্রচলিত আস্তিক্যবাদের ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর উপজাতি ও মানবসমাজ-উদ্ভুত বহু ধারণার জটিল সমন্বয়, যা সামাজিক অনুভূতি জাগায় ও সংগঠিত করে, যার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজের যোগসূত্র স্থাপন ও জৈবিক ব্যক্তিসত্তাকে বেঁধে ফেলা'। লেনিন এর বিরোধিতা করে বললেন, এটা বগনানভীয় ভাববাদী ধারণা এ সময় ঈশ্বর প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিকতা। বন্ধু গোর্কিকে রেয়াৎ না করে বললেন ঐ ধারণা প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ ঈশ্বরীয়

---

intention) repeats the hocus-pocus of the priests: you eliminate from the idea of God everything about it that is historical and drawn from real life (filth, prejudices, sacrificed ignorance and degradation, on the one hand, serfdom,monarchy, on the other), and instead of the reality of history and life there is substituted in the idea of God a gentle petty-bourgeois phrase(God= 'ideas which awaken and organize social feelings') – Lenin Coll Works, Vol 35, pp 127-28)

[4] এঙ্গেলস ধর্মের আরেকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে -: "the fantastic refection in man's minds of those external forces which control the daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatutal forces. In the beginning of history it was the forces of nature which were the first so reflected and which in course of further evolution underwent the most manifold and varied personifications among the various peoples… But it is long before, side by side with the forces of nature, social forces begin to be active – forces which confront man as equally alien and at first inexplicable, dominating him with the same apparent natural necessity as the forces of nature themselves."

ধারণা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, 'সামাজিক অনুভূতি'কে ভোঁতা করে, সজীবকে মৃতবৎ করে দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়।

কিন্তু লেনিন ধর্ম-প্রসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টিকোন কি হওয়া উচিত, সে নিয়ে আত্যন্তিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মার্কসবাদ যেহেতু বস্তুবাদ-ভিত্তিক, তিনি বলেছিলেন, ধর্মের প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণিকে নিরন্তর শুধু বিরোধিতা করলেই হবেনা,শত্রুবৎ আচরণ করতে হবে(সং রচ, খন্ড ১৫ পৃ ৪০৩-৪)। তিনি এরফুর্ট কর্মসুচির (১৮৯১) কথা (সোশ্যাল ডেমক্র্যাসীর রাজনৈতিক কৌশল প্রসঙ্গে) বলেছিলেন, কিন্তু সেখানে বলা হয়েছিল ,'রিলিজ্যন ইজ আ প্রাইভেট ম্যাটার', ধর্মাচরণের আদ্যন্ত বৈর, তা বলা হয়নি। ঐ লেখায় (বক্তৃতা) লেনিন নিজেই তা উদ্ধত করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চশ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন, 'পুরোহিত-তন্ত্র স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ', যার জন্য হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেজন্যে তিনি লিখেছিলেন, 'ব্রামহনজাতির কতর্ব্য - ভারতের অন্যান্য জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা।---- তিনি যদি শুধু টাকার চেষ্টায় ঘরিয়া বেড়ান, তাঁহাকে যথার্থ ব্রামহন বলা যায়না' (পুরোহিত ও অধিকার)। বণবিভাগের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক' (বৈসাদৃশ্য দূর কর)। তথাচ বিবেকানন্দ ব্রামহন্য আধিপত্যের পক্ষে ছিলেন। মনু সংহিতা উৎকলিত করে (ব্রামহমো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।/ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে) যুক্তি খাড়া করলেন যে তাঁদের কাছে আছে 'ধর্মের ভান্ডার'। স্বামীজি তো ধর্মবিরোধী (বিশেষত হিন্দু ধর্ম) ছিলেননা, এবং ব্রামহন্য আধিপত্যের পক্ষেও, তা না হলে তিনি যে প্রশ্ন প্রকাশ্যে রাখতেন, তা হল যে অন্যান্য বর্ণের মানুষেরা ঐ ভান্ডার-বন্চিত হল কেন?

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সমপাদক অর্ধেন্দু ভূষণ বর্ধন ১৯৯১ সালে (তখন তিনি সাধারণ সমপাদক হননি) পার্টির অধুনা-লুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'পার্টি লাইফ' এ একটি প্রবন্ধে - মাকসজিম,রিলিজ্যন ,হিন্দুত্ব -ভারতীয় উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক দৃষ্টিতে ধর্মের বিতর্ক তুলে ধরেন। বৌদ্ধধর্ম ও সাংখ্য দর্শনে যে যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতার স্বীকৃতি আছে তা পশ্চিমী পন্ডিতেরা (মার্কসবাদী তাত্বিকরাও) চর্চা করেননি। বর্ধন লেখেন যে, বৌদ্ধধর্ম কোনো ঐশ্বরীয় ডক্ট্রিন, সর্বশক্তিমান বা সর্বপ্রজ্ঞাবান ঈশ্বর প্রভৃতি ধারনার কথা বলেননি। কারণ গৌতম বুদ্ধ আধিভৌতিক কিছু মানতেন না। আমি মনে করি ঐ প্রবন্ধটি ব্যালা, উরদু, হিন্দী, তামিল, মালয়ালি ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত ও বহুল-প্রচারিত হওয়া উচিত, ধর্মানধদের (আমি মৌলবাদী শব্দটি এদের প্রতি প্রযোজ্য নয় মনে করি, কারণ ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটি বিজ্ঞানেই প্রয়োগ করা উচিত) এভাবেই বিতর্কে নামতে বাধ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলছি যে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর', এই ধারণার সম্ভবত কোনো শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই । উপনিষদে আছে, 'প্রশ্নেন পরিপ্রশ্নেন'[৫]

বর্ধন যথার্থ লিখছিলেন যে, কমিউনিস্টরা ধর্ম থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু যখন তা সামাজিক রূপ নেয় - যেমন, দুর্গাপূজা, ঈদ, ক্রিসমাস - সেখানে মিলন-অনুষ্ঠান বা মোলাকাতে তাঁরা অংশ নিতেই পারেন[৬]।

---

[5] "Question, Counnter-question"

[6] বর্ধন লিখেছেন, : "Marxists recognize that they must respect the individual's religious belief. We seek no conflict between us and true devotees of all faiths. We respect the right to their beliefs ….
What about Marx's aphorism that ' religion is the opium of the people?' I have indicated that the aphorism torn from its contect is interpreted one-sidedly.

এখানে লেনিনের কথা তিনি অন্ধভাবে না মেনে ঠিকই করেছেন। তাতে তিনি মোটেই অমার্কসবাদী হয়ে জাননি। কারণ মার্কসবাদ কোন পয়গম্বরের আপ্তবাক্য নয়, কর্মের নির্দেশ।

শেষত, বিজ্ঞানীকে কি নাস্তিক হতেই হবে? এ নিয়ে তর্কের মীমাংসা হয়নি। আমাদের ছাত্রজীবনে (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হবার সুবাদে) পেয়েছি ফাদার গোরে বা ফাদার ওয়েরস্ট্র্যাটিনের মত বিজ্ঞানীকে। তাঁদের বিজ্ঞান-মানস কোথাও ধর্মীয় দায়বদ্ধতায় ক্ষুন্ন হয়েছিল কি? নিশ্চয়ই না। তবু এ নিয়ে বিতর্ক চলুক। অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কিংবদন্তীপ্রতিম সংগঠক ও সাধারণ সমপাদক (১৯৩৩-৪৮) পূরণচাঁদ যোশী বলতেন সৃজনশীলতা জারিত হয় 'ক্ল্যাশেস অফ আইডিয়াজ' থেকে। এই 'ক্ল্যাশেস অব আইডিয়াজ' এর প্রেক্ষাপট তাই রুদ্ধ করে দেওয়া উচিৎ নয়, আকাংক্ষিত নয় অন্যের মুখ চেপে ধরা । বলপ্রয়োগ কোন প্রগতিশীল সিস্টেম গড়ে তুলার চাবিকাঠি নয় । বল প্রয়োগে চেতনার মুক্তি ঘটে না । আসলে ভুল যুক্তির মানুষেরও তাদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া উচিৎ । চিন্তা করার সাহস, প্রশ্ন করার সাহস বিতর্কের মাধ্যমে ভুল যুক্তিকে পরাস্ত করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা কিন্তু সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই অংগ । অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে, প্রশ্নহীন আনুগত্যের মধ্য দিয়ে কোন সিস্টেমই দীর্ঘদিন জোর করে টিকিয়ে রাখা যায় না, তা যতই 'সাম্যবাদী' কিংবা 'জনকল্যানমুলক' বলে প্রচারিত হোক না কেন, আর আমরা তা পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে জেনেছি । ভাবমূর্তি পূজায় আপ্লুত হয়ে অন্ধ স্তাবকতা নয়, বরং প্রতিটি দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, বঞ্চনা কিংবা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ - সংঘাত আর নির্মাণের মাধ্যমেই সভ্যতা এগিয়ে যাক সুস্থ সংস্কৃতির দিকে ।

শঙ্কর রায়, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ভাস্যকার। মুক্তমনায় নিয়মিত লিখে থাকেন। ইমেইল - sankarray62@rediffmail.com

সম্পাদকের নোট : কার্ল মার্ক্স উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ বিশেষজ্ঞ। শ্রেণীহীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল একসময় বিশ্বের বহু মুক্তিকামী মানুষকে। ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুস্থ আলোচনা আজো তাই প্রাসঙ্গিক। সে হিসেবে এ প্রবন্ধটি বইয়ে আলাদা উপযোগ তৈরী করবে নিঃসন্দেহে।

তারপরও কিছু জিনিস আমাদের সবসময়ই মাথায় রাখতে হবে। মার্ক্সের প্রতিটি কথাই কিন্তু অভ্রান্ত নয়। এক সময় তার তত্ত্বের অনুরাগীরা কিন্তু সেভাবেই মার্ক্সকে দেখতেন। তারা ভাবতেন, এই মতবাদ এমন এক 'সত্যের' উপর প্রতিষ্ঠিত যা থেকে পদস্খলন কখনোই সম্ভব নয়। ঢালাওভাবে তার সমস্ত বানীকে 'বৈজ্ঞানিক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। কিন্তু রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বজুরে কমিউনিস্ট বিশ্বের পতনের পর সে সমস্ত বাণীর অভ্রান্ততা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী জুরে পুঁজিবাদ বা ধণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরোণের যে 'আমূল ভবিষ্যদ্বানী' মার্ক্স করেছিলেন, আজকের বিশ্বের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে মনে হয় পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি সেভাবে যায়নি। মার্ক্স মনে করেছিলেন যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়

শ্রমিক শ্রেনী বুঝি কেবল শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হবে এবং এর ফলে শ্রমিক শ্রেনীর পিঠ 'দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ায়' তারা ধণতান্ত্রিক সিস্টেমের পতন ত্বরান্বিত করবে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জায়গায় সফলতা এলেও ধনতন্ত্রের পতন হয়নি, বরং বলা যায় ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদি ব্যবস্থা নিজস্ব সিস্টেমের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে বিবর্তিত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের 'ওয়েল ফেয়ার স্টেট' গুলো শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে অনেক বেশী মনোযোগী। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে শ্রমিকেরা নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারছে অনেক ভালভাবে এই পুঁজিবাদী সমাজেই। তারা কিন্তু বিপ্লবের পথে যাচ্ছে না। পুঁজিবাদী শোষণের কারণে 'দেয়ালে পিঠ' ঠেকে গেলে যদি বিপ্লব হয়ে যেত, তাহলে বিগত ত্রিশের দশকে সারা দুনিয়া জুরে অর্থনৈতিক মন্দার দুঃসময়ে কেন কোন বিপ্লব হল না সে ব্যাপারটি মোটেই বোধগম্য নয়। এরকম উদাহরণ আছে বহু।

মার্ক্স আরো মনে করেছিলেন পুঁজিবাদী সমাজে 'ক্লাস পোলারাইজেশন' তীব্র থেকে তীব্রতর হবে এবং শোষণ -শোষিতের (মার্ক্সের ভাষায় বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত) মধ্যে শ্রেনীবৈষম্য তীব্রতর হবে। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় য়ামরা দেখছি, নানান ধরণের সমস্যার শিকার হয়েও সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেনীর ক্রয় ক্ষমতা ও দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে এবং সর্বোপরি মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণীভুক্ত মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত আধুনিক বিশ্বের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সনাতন শ্রমিক এবং কাঁচামালের সংজ্ঞাই পালটে দিয়েছে। এপ্রসঙ্গে কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজতাত্ত্বিক ড রামকৃষ্ণ মুখার্জির বক্তব্য প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তিনি মনে করেন, ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিশীলিত রূপ গ্রহণ করার ফলে শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ কায়িক শ্রম দানের পরিবর্তে বুদ্ধিজনিত শ্রমদান (মেন্টাল লেবার) করছে এবং তারাই মধ্যবিত্তসূলভ জীবন জাপন করছে। প্রতিবছরই তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে এইচ ওয়ান ভিসায় আমেরিকায় আসছে আজার হাজার 'মেন্টাল লেবারের' দল, যারা তৈরি করেছে এক দৃশ্যমান বলিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেনী। বলা বাহুল্য, এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বুদ্ধিমত্তা ও মানসিকতা আপামোর জনগণের কাছে সাধারণ মানদন্ড হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং সমাজে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হবার মধ্য দিয়ে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। মার্ক্সের সনাতন ধারণায় সমগ্র উ□পাদিকা শক্তিকে কেবলমাত্র কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেছিলেন - যা আজকের দুনিইয়ার সাপেক্ষে অনেকটাই বাতিলযোগ্য।

এ ছাড়া মনে রাখতে হবে, শুধু শ্রেনীগত কিংবা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়, আজকের দুনিয়ার জটিল সমাজে আরো নানা ধরণের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত (যেমন, জাতিগত, লৈঙ্গিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয়) রয়েছে যা পৃথিবীর গতিপথ নির্ধারণে অনেক সময়ই নিয়ামক ভুমিকা পালন করেছে - মার্ক্স সেগুলো তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি, শুধু 'ক্লাস কনফ্লিক্ট'কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কাজেই আজকের দিনে মার্ক্সের ব্যাখ্যা কতটুকু বৈজ্ঞানিক তা নির্মোহ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতে শ্রেণীবিভাগের তাৎপর্য' শীর্ষক লেখায় মন্তব্য করেছিলেন, 'শ্রেণী ছাড়াও আসলে অসাম্যের অনেক উৎস আছে; অসুবিধা আর বৈষম্যের সমস্ত কিছু কেবলমাত্র শ্রেনী দ্বারাই নির্ধারিত হবে - এই ধারণা ত্যাগ করতে হবে'। বিজ্ঞানের দার্শনিক কার্ল পপার (১৯০২-১৯৯৪) তার 'ফলসেফায়াবিলিটি' বা 'ভুল প্রমাণেয়তা' তত্ত্বের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, মার্ক্সিজম এক ধরনের ছদ্মবিজ্ঞান (pseudoscience)। পপারের ভাষায় -

> ‘বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ তত্ত্বগুলোকে কঠিন প্রায়োগিক পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে চালানো হবে। যখন কোন তত্ত্বকে পরীক্ষণের চেয়ে বরং সুরক্ষিত করে রাখার চেষ্টা করা হয়, তখন বুঝতে হবে এর মধ্যে গলদ রয়েছে’।

মার্ক্সের তত্ত্বের বিরুদ্ধে এটি একটি গুরুতর অভিযোগ সবসময়ই। যখন মার্ক্সের অনুরাগীরা দেখলেন পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি মার্ক্সের দেখানো পথে যাচ্ছে না, তখন তাদের দরকার ছিল এই তত্ত্বকে বাতিল করে নতুন তত্ত্বের খোঁজ করা। তা না করে তারা পুরোন তত্ত্বকেই তারা আঁকড়ে ধরে রইলেন, এবং তত্ত্বকে জোড়া তালি দিয়ে একধরণের যথার্থতা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। পপারের মতে এ ধরণের কর্মকান্ড বিজ্ঞানমনস্কতার পরিপন্থি। সত্যি বলতে কি, এ ধরনের মনোভাবই তৈরি করে অন্ধ স্তাবকের এবং একটি তত্ত্বকে ঠেলে দেয় বিজ্ঞান থেকে অপবিজ্ঞানের দিকে। কার্ল পপার ছাড়াও মার্ক্সের ‘লেবার থিওরী অব ভ্যালু’র সমালোচনা রয়েছে একাডেমিয়ায়। আধুনিক অর্থনীতিতে তার তত্ত্বকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ‘মার্জিনাল ইউটিলিটি’ তত্ত্ব দিয়ে। এছাড়া উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভোন, কার্ল মেঞ্জার কিংবা বোম ব্যাওয়ার্কের সমালোচনাগুলো পড়া যেতে পারে।

লুইস ফুয়ের, বার্ট্রান্ড রাসেল, গিবন প্রমুখ দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী, এবং ঐতিহাসিকেরা সময় সময় দেখিয়েছেন মার্ক্সের তত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মের সাযুজ্যই বেশী। যে ভাবে কমিউনিজম সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল তা ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত ঈশ্বর কর্তৃক পরকালে স্বর্গের স্বপ্নময় আবেদনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ধার্মিকরা যেমন কোরান, বেদ, বাইবেল, হাদিস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মহাসত্য খুঁজে পান, এবং মুহম্মদ, যীশু এবং অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের বানীকে শিরোধার্য করে রাখেন, এবং তাদের দেখানো পথেই নিজেদের চালিত করতে চান- ঠিক সেভাবেই কমিউনিস্টরা অনেকটা মার্ক্স, লেলিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি, মাও এবং তাদের লেখা লাল বইগুলোকে দেখতেন। ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে নিজ নিজ ধর্ম প্রতিষ্ঠার নামে ঢালাওভাবে বিধর্মীদের উপর অত্যাচার করেছে, ঠিক তেমনি কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা এবং বিপ্লবেরর নামেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, গুলাগে প্রেরণ করা হয়েছে অনেক প্রগতিশীল মানুষকে, ‘শ্রেনীশত্রু’ কিংবা ‘পুঁজিবাদের দালালের’ তকমা এঁটে নির্যাতন করা হয়েছে কিংবা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদদের নির্যাতন, নির্বাসন, কারাগারে নিক্ষেপ, শ্রমশিবিরে প্রেরণ, মস্তিস্ক ধোলাই ইত্যাদি সেই মধ্যযূগীয় ধর্মের কৃষ্ণ ইতিহাস ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ‘কাফের নিধন’, কিংবা ‘নির্যবন করো সকল ভুবনের’ মত ‘বুর্জোয়াদের খতম কর’ ধ্বনি দিয়ে শ্রেনীহীন সমাজ গড়বার প্রেরণা ছিলো কমিউনিজমের অপরিহার্য শ্লোগান। ক্রুসেড, জ্বিহাদ ধর্মযুদ্ধের মতই ছিলো তাদের এই শ্রেনীসংগ্রামের লড়াই। গণহত্যার গবেষক রুমেলের মতে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় ছয় কোটি লোককে কমিউনিজমের নামে হত্যা এবং নির্যাতন করা হয়েছিলো, চীনে ১৯৪৯ সাল থেকে ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লবের’ সময় পর্যন্ত দশ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল। কম্বোডিয়ায় পলপটের সৈন্যবাহিনীর হাতে চার বছরে নিহত হয় প্রায় বিশ লক্ষ লোক। রুমেলের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে সহজেই কিন্তু তারপরও বলা যায়, একটি ‘বৈজ্ঞানিক’ সমাজব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ঢালাওভাবে এত মানুষের প্রাণহানী কেন ঘটাতে হবে সে প্রশ্ন উত্থাপন মোটেই অসমীচীন নয়। আসলে ‘কমিউনিজম নিজেই

একটি ধর্ম' কিনা ঢালাওভাবে এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় এর মধ্যে ধর্মের উপাদান রয়ে গেছে - প্রচ্ছন্নভাবেই।

আরো কিছু নমুনা পেশ করা যাক। মার্ক্সিজমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেলিন উপংহার টেনেছিলেন এই বলে যে, সাম্রাজ্যবাদ বা 'ইম্পেরিয়ালিজম' হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের উপঢৌকন। পুজিবাদী বিশ্ব যে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে না তা নয়, বহুলাংশেই করে কিন্তু, কথা হচ্ছে, মার্ক্সীয় ধারণায় যেমন মনে করা হয়েছে 'স্যোশালিস্ট' দেশ গুলো যেহেতু পুঁজিবাদ থেকে মুক্ত থাকবে, সে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ থাকবে না। কিন্তু আমরা দেখেছি সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব পুঁজিবাদী বিশ্বের মতই সমান আগ্রাসী। হাঙ্গেরী (১৯৫৬), চেকোশ্লাভাকিয়া (১৯৬৮), আফগানিস্তান (১৯৭৯)-এর উপর রাশিয়ার আগ্রাসনের ইতিহাস কারো অজানা নয়, অজানা নয় তীব্বতের প্রতি চীনের মনোভাবও। কাজেই সাম্রাজ্যবাদ কেবল পুঁজিবাদী বিশ্বের একচেটিয়া ভাবলে ভুল হবে।

রাশিয়া একসময় জেনেটিক্সের গবেষণায় শীর্ষস্থানে ছিলো, অথচ স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়ায় 'জেনেটিক্স' এর উপর গবেষণার লালবাতি কিভাবে জ্বলে গিয়েছিল আমরা তা সবাই আজ জানি। বাম ঘরণার অনেকেই একটা সময় জেনেটিক্স বা বংশগতিকে পাত্তা না দিয়ে কেবল পরিবেশ নির্ণয়বাদকে আদর্শ হিসেবে করতেন, কারণ তা তাদের 'সাম্যবাদের বাণী' প্রচারে সহায়তা করে। আর এ কারণেই মার্ক্স কিংবা তার পরবতী তাত্ত্বিক কমিউনিস্টরা তাদের অনেক বাণীতেই এটাই জোরের সাথে বলেছিলেন যে মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যই পরিবেশের ফল, এর সাথে বংশের কোন যোগ নেই। লেলিন এবং তার সমসাময়িক নেতারা ভাবতেন, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুই 'মার্ক্সিজমের ছাকুনি'র মধ্য দিয়ে যেতে হবে, নইলে পরিশুদ্ধ হবে না! যেমন লেলিনের মার্ক্সবাদী নির্দেশ ছিল –'Literature must become party literature... Down with non partisan literatures.' পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ায় স্ট্যালিন মার্ক্সসীয় মতবাদের সংগে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে বংশাণুবিদ্যাকে বিকৃত করতেও পিছপা হননি । এই উদ্দেশ্যে তিনি লাইসেঙ্কো নামক এক ঠগ বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করেন। যখন ভাভিলভ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা লাইসেঙ্কোর তত্ত্বের ভুল ধরিয়ে দেন তখন স্ট্যালিন তাদেরকে গুলগে পাঠিয়ে দেন। তারপর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। স্ট্যালিনএর প্রতিহিংসার স্বীকার হয়ে আরো প্রাণ হারান কার্পেচেঙ্কো, সালমোন লেভিট, ম্যাক্স লেভিন, ইস্রায়েল আগলের মত বিজ্ঞানী। শুধু লাইসেঙ্কো নয়, স্ট্যালিন জামানায় লেপিশিঙ্কায়া নামের আরেক ঠগ বিজ্ঞানীকে প্রমোট করা হয়েছিল - সেই 'পুঁজিবাদী' জেনেটিক্স সরাতে। আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রদান করার পর, ব্যাপারটা 'মার্ক্সিজমের সাথে সংগতিপূর্ণ' মনে না করায় 'সোভিয়েত এন্সাইক্লোপিডিয়া' প্রকাশ করা হয় রিলেটিভিটিকে 'নস্যাৎ' করে। এর প্রতিবাদ করায় পদার্থিবিদ জর্জ গ্যামোকে পালাতে হয়েছিলো রাশিয়া ছেরে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আঁদ্রে শাখারভ এবং সলঝনিৎসনের কপালেও জুটেছিল স্ট্যালিনীয় জামানার অত্যাচার আর নির্যাতন । পাস্তারনাক 'ডক্টর জিভাগো' রচনা করে ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন; স্ট্যালিন চাপ প্রয়োগ করে এই মহান কবিকে দিয়ে স্ট্যালিনের স্তুতি করাতে চেয়েছিলেন। পাস্তারনাক রাজী হননি। লাং-ক্যাম্পারে পাস্তারনাকের মৃত্যুর পর তার শেষকৃত্যে উপস্থিত লোকজনকে স্ট্যালিন সরকার গ্রেফতার করে। এর মধ্যে সিন্যভস্কি এবং দানিয়েলের মত চিন্তাশীল মানুষেরাও ছিলেন। এদেরকে বিনা বিচারে কারাদন্ড দেওয়া হয়। এই দৃষ্টান্তগুলো আসলে বহুল প্রচারিত 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' শ্লোগানের বিরুদ্ধেই যায় বলে মনে হয়।

'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' কথা বলা হলেও সত্যিকার বিজ্ঞানের সাথে সমাজতন্ত্রের মাত্রাগত পার্থক্যটুকু পরিস্কার না করলে অন্যায় হবে। যে কোন 'ইজম' আসলে বৈজ্ঞানিক সার্বজনীনতার অন্তরায়। একজন পদার্থবিদ কখনোই নিজেকে 'নিউটোনিস্ট' কিংবা 'আইনস্টাইনিস্ট' হিসেবে পরিচিত করেন না। কারণ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র কিংবা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানেরই অংশ। কাজেই আলাদা করে কারো 'আইনস্টাইনিজম' চর্চা করার কিছু নেই। একই কথা জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও খাটে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ কিংবা মেন্ডেলের বংশগতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এগুলো জীববিজ্ঞানেরই অংশ। সে হিসেবে প্রতিটি জীববিজ্ঞানীই কিন্তু বিবর্তনবাদী। ল্যামার্কের মতবাদ ভুল প্রমাণিত হওয়ার ফলে সেটা জীববিজ্ঞানের অংশ হতে পারেনি, সেটা অপাংক্তেয় হয়ে আছে 'ল্যামার্কিজম' অভিধায় অভিসিক্ত হয়ে। কাজেই সোজা কথায় যে কোন ধরণের 'ইজম' বৈজ্ঞানিক ধারণার পরিপন্থি। অথচ মার্ক্সিজম বা কমিউনিজমে সব কিছু ছাপিয়ে 'ইজম'টাই যেন বড় হয়ে উঠে। একে তো সকল পদার্থবিজ্ঞানীই যেমন 'আইনস্টাইনিস্ট', সেরকম সকল অর্থনীতিবিদদের সবাই যে 'মার্ক্সিস্ট' তা কিন্তু বলা যাবে না। বহু বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আছেন যারা মার্ক্সিজমকে ভ্রান্ত মনে করেন। কাজেই এটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে সার্বজনীন তা বলা যাবে না। আবার একই মার্ক্সিস্টদের মধ্যেও আমরা দেখি শতভাগ। কেউ লেলিনিস্ট, কেউ স্ট্যালিনিস্ট, কেউ ট্রটস্কিস্ট, কেউ বা মাওইস্ট। সবাই যে যার মত নিজেদের আবার 'সত্যিকার মার্ক্সিস্ট' মনে করেন। বাংলাদেশে ভাসানী, ন্যাপ, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, সর্বহারা পার্টি, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি - এরকম নানা নামের বৈধ, অবৈধ কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে। এদের অনেকেই একসময় সমাজতন্ত্র কায়েমের নামে ঘোট পাকিয়ে শ্রেণীশত্রু মেরেছেন, কখনো ড. হুমায়ুন কবিরের মত বরেণ্য বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করেছেন, কখনো বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে। এমনকি একাত্তরে কোন কোন গ্রুপ পৃথক সায়ত্বসাসিত 'সরকার' গঠণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তও হয়েছিলেন বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তারা এগুলো যখন করছিলেন, তারা মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমেই এগুলো জায়েজ করতেন। পরে যখন তাদের এই সমস্ত গণবিরোধী কর্মকান্ড দিনের আলোয় উঠে এসেছে, তখন তারা সাফাই গেয়েছেন এই বলে - ' মার্ক্সের তত্ত্বে কোন ভুল নেই - এটা স্রেফ পার্টির লাইনগত ভুল'! অবশ্য সব কমিউনিস্টই যে এই 'খতমের লাইন'কে সঠিক মনে করতেন তা নয়, সিপিবির মত কিছু 'মডারেট কমিউনিস্ট' দলের কর্মীদের দেখেছি খতমের লাইনে না গিয়ে বরং গণতান্ত্রিক পথেই আন্দোলন করতেন। এখানেও ধর্মবাদীদের সাথে মিল লক্ষ্যনীয়। চরম্পন্থি ইসলামের অনুসারীরা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে 'জিহাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করে কোরান হাদিসের আলোকে অনেকেই বৈধতা দেন, আবার অনেক 'মডারেট মুসলিমেরা' এ ধরণের চরমপন্থি কার্যকলাপকে দেখেন ঘৃণার চোখে - বলেন, এদের কর্মকান্ডের সাথে 'শান্তিপূর্ণ ইসলামের' কোনই সম্পর্ক নেই। ধর্মবাদীদের মতই কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যে চরমপন্থি, মডারেটপন্থি, মধ্যপন্থি সব ধরণের অনুসারীই আছেন। এজন্যই ড. ফজলুর রহমান তার 'ইসলাম' (১৯৬৬) গ্রন্থে বহু আগেই বলেছিলেন, 'ইসলাম স্বভাবে কমিউনিজমের মতই'। কথাটা ঘুরিয়ে বলেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। আবার এর পাশাপাশি আমরা পেয়েছি 'ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি' গোত্রের ঈদ, পুজো, মিলাদে অংশ নেওয়া এবং এগুলোতে বিশ্বাস করা মার্ক্সবাদী। জ্যোতিষীদের রত্নপাথর হাতে পরা, ভুত-ভবান-শয়তান, রাশিফল, উদৃষ্টে বিশ্বাসী মার্ক্সবাদীরাও সংখ্যায় বিরল নয়। এদের অনেকেই গণেশের দুধ খাওয়া নিয়ে সারা ভারতে গণহিস্টেরিয়ার সময় বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার পক্ষে না থেকে বরং গনেশের অলৌকিকতার সাফাই গেয়েছেন। এদেরই একাংশ মুসলিমদের

ভোটব্যাংক অক্ষুন্ন রাখতে তসলিমা নাসরীনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এগুলো সবই আবার তারা করেছেন মার্ক্সবাদের দোহাই দিয়ে - 'দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে' সমাজ বিশ্লেষণ করে। কাজেই, এদের তত্ত্ব এবং কর্মকান্ড আসলেই কতটুকু 'বৈজ্ঞানিক' তা সঠিক বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

এতদ সত্ত্বেও, মার্ক্সবাদের তাৎপর্য এখনো অনেকের কাছেই প্রাসংগিক। সনাতন মার্ক্সবাদের পরবর্তী মার্ক্সবাদীরা, যেমন - গ্রামস্কি, এলথুজার কিংবা দেরিদো যে সমস্ত পোস্ট মডার্নিস্ট ব্যাখ্যা হাজির করেছেন সেগূলো আমাদের জানা প্রয়োজন। এ ছাড়া ভুলে গেলে চলবে না যে, সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব সহ লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত মানুষ মুক্তিসংগ্রামে সামিল, তাদের অনেকের কাছেই মার্ক্সবাদ এখনো আলোকবর্তিকা। সম্প্রতি নেপালে মাওবাদীরা যেভাবে দীর্ঘদিনের রাজতন্ত্রকে উতখাৎ করেছে তা অনেক মার্ক্সিস্টকেই উদ্দীপ্ত করেছে। আমি শঙ্কর রায়কে এই প্রাসঙ্গিক লেখার জন্য ধন্যবাদ জানাই।